ধর্ম্ম

ব্রজগোপীদিগের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—"লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম। লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ-মর্ম্ম॥ দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন। স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন॥ সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। আদি ৪র্থ॥" আবার ব্রজগোপী এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুঁহে করয়ে মিলন। আদি ৪র্থ॥" ব্রজলীলা-প্রকটনের উদ্দেশ্য-প্রকরণে জীব সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে—"ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম-কর্ম্ম॥ আদি ৪র্থ॥" অন্যত্রও বলা হইয়াছে—"বিধিধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ। নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥ মধ্য ২২শ॥" শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়ও অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জীবকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন:—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। ১৮।৬৬॥" শ্রীমদ্‌ভাগবতেও ধর্ম্মত্যাগের প্রশংসা দৃষ্ট হয়;—"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ॥ ১১।১১।৩২॥"

এইরূপে নানাস্থানে ধর্ম্মত্যাগের আদেশ এবং অবস্থাবিশেষে ধর্ম্মত্যাগের প্রশংসার কথা দৃষ্ট হয়। আবার "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ গীতা। ২।৪০॥"-ইত্যাদি বাক্যে ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া থাকার উপদেশও দৃষ্ট হয়। সুতরাং ধর্ম্মত্যাগের উপদেশই বা কেন দেওয়া হইল, আবার ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণের উপদেশই বা কেন দেওয়া হইল, অধিকন্তু পরিত্যাজ্য এবং অবলম্বনীয় ধর্ম্মের মধ্যেও কোনওরূপ পার্থক্য আছে কিনা—তাহা নির্ণয় করার বাসনা স্বভাবতঃই চিত্তে উদিত হইয়া থাকে।

ধর্ম্ম কাকে বলে। সাধ্যধর্ম্ম ও সাধন-ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বলিতে কি বুঝায়, সর্ব্বাগ্রে তাহা জানা দরকার। ধৃ+মন্=ধর্ম্ম। ধৃ-ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয়-যোগে ধর্ম্ম-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ধৃ-ধাতুর অর্থ ধারণ করা বা ধরা; আর মন্ প্রত্যয় কর্ত্তৃবাচ্যে প্রয়োজিত হয়, করণ-বাচ্যেও হয়। মন্-প্রত্যয় যখন কর্ত্তৃবাচ্যে প্রযুক্ত হয়, তখন ধর্ম্ম-শব্দের অর্থ হইবে "ধারণ করে যে—ধারণ করিয়া রাখে যে।" আবার করণবাচ্যে মন্-প্রত্যয়ের প্রয়োগ হইলে ধর্ম্ম-শব্দের অর্থ হইবে—"ধারণ করা যায় যদ্দ্বারা—ধারণ করিয়া রাখা হয় যদ্দ্বারা।" তাহা হইলে ধর্ম্ম-শব্দে ধারণের কর্ত্তা এবং ধারণের করণ বা সহায় দুইই বুঝায়। কিন্তু ধৃ-ধাতু সকর্ম্মক; ধারণের কর্ম্ম কে? কাহাকে ধারণ করা হয়? যার ধর্ম্ম, তাকে ধারণ করা হয়। একটী দৃষ্টান্ত লইয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। তরল জল গরমই হউক বা ঠাণ্ডাই হউক, সকল অবস্থাতেই আগুন নিবাইতে সমর্থ। এই অগ্নিনির্ব্বাপকত্ব জলের একটী গুণ। জল যতক্ষণ স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত থাকিবে, ততক্ষণ তাহাতে এই গুণটী থাকিবেই; এই অগ্নি-নির্ব্বাপকত্বই জলের পরিচায়ক, জলের জলত্বের সাক্ষী; সুতরাং অগ্নি-নির্ব্বাপকত্বই জলকে জলত্ব দান করে বা জলকে জলত্বে ধারণ করিয়া রাখে—জলকে তাহার নিজের স্বরূপে ধারণ করিয়া রাখে; তাই অগ্নি-নির্ব্বাপকত্ব হইল জলের ধর্ম্ম—কর্ত্তৃবাচ্যের অর্থে ধর্ম্ম। আবার জল বিকৃত হইয়া যখন বরফ বা বাষ্পে পরিণত হয়, তখন তাহার অগ্নি-নির্ব্বাপকত্ব থাকে না। শীতলত্বের প্রয়োগে বাষ্প যখন জমিয়া তরল জলে পরিণত হয়, কিম্বা উত্তাপের প্রয়োগে কঠিন বরফ গলিয়া যখন তরল জলে পরিণত হয়, তখন আবার তাহাতে অগ্নি-নির্ব্বাপকত্ব গুণ দৃষ্ট হয়; বিকৃত জল তখন স্ব-স্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তাহা হইলে, উত্তাপ বা শৈত্যই হইল বিকৃতি-প্রাপ্ত জলকে স্বীয়-স্বরূপে আনয়ন করিবার উপায় বা করণ—এই উত্তাপ বা শৈত্য দ্বারাই জল বিকৃত-অবস্থা হইতে স্বীয় স্বরূপে ধৃত হয়; সুতরাং উত্তাপ বা শৈত্য-প্রয়োগই হইল করণবাচ্যের অর্থে জলের ধর্ম্ম বা জলত্বের সাধন। বস্তুতঃ বিকৃত-অবস্থায়ও অগ্নি-নির্ব্বাপকত্ব তাহাতে থাকে—তবে তাহা প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে মাত্র; শৈত্যাদি-প্রয়োগে তাহা প্রকটিত হয়; প্রকটীকরণের উপায়ই হইল সাধন। বরফ বা বাষ্প যদি সচেতন হইত, সুতরাং নিজেই নিজের উপরে উত্তাপ বা শৈত্য প্রয়োগ করিতে পারিত, তাহা হইলে উত্তাপ বা শৈত্য প্রয়োগ করাই হইত জলের করণ-ধর্ম্ম বা সাধন-ধর্ম্ম; আর জলত্ব বা অগ্নিনির্ব্বাপকত্ব হইত তাহার চরম-লক্ষ্য—চরম অনুসন্ধেয়—সাধনের চরম বস্তু বা সাধ্যবস্তু—ইহাই হইত তাহার সাধ্যধর্ম্ম। জীব-সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে

গেলে দেখা যায়—ভক্তিশাস্ত্রানুসারে, জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস, শ্রীকৃষ্ণসেবাই তাহার স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য—শ্রীকৃষ্ণসেবাই জীবকে স্বীয়-স্বরূপে (কৃষ্ণদাসত্বে) ধারণ করিয়া রাখে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসেবাই বা শ্রীকৃষ্ণসেবার প্রবর্ত্তক যে কৃষ্ণপ্রীতিবাসনা, তাহাই হইল জীবের সাধ্যধর্ম্ম—কর্ত্তৃবাচ্যের অর্থে ধর্ম্ম। আর মায়াবদ্ধ জীবের—মায়ামলিনতা-বশতঃ বিকৃত-অবস্থাপন্ন জীবের—চিত্তে সেই বাসনা প্রকটিত করার নিমিত্ত—জীবের স্বরূপ-অবস্থা পরিস্ফুট করার নিমিত্ত—যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিতে হয়, সেই সমস্ত উপায়ই হইল—স্বরূপাবস্থায় উন্নীত হইয়া সেই অবস্থায় ধ্রুত থাকিবার উপায় বা সাধন-ধর্ম্ম—করণবাচ্যের অর্থে ধর্ম্ম। যোগমার্গ বা জ্ঞান-মার্গাদির শাস্ত্রানুসারেও জীবের স্বরূপানুরূপ সাধ্যধর্ম্ম ও সাধন-ধর্ম্ম আছে। এইরূপে ধর্ম্মের দুইটী অঙ্গ দৃষ্ট হয়—একটী কর্ত্তৃবাচ্যাত্মক, অপরটী করণবাচ্যাত্মক; কর্ত্তৃবাচ্যাত্মক অঙ্গ হইল সাধ্য ধর্ম্ম—জীবের সাধনের লক্ষ্য; আর করণ-বাচ্যাত্মক অঙ্গ হইল সাধন-ধর্ম্ম—জীবের ভজনাঙ্গের বা সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান-সমূহ।

সমাজ-ধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, বেদ-ধর্ম্ম, আচার। এ পর্য্যন্ত জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্যের সহিত সংশ্লিষ্ট—বা জীব-স্বরূপের অনুরূপ—ধর্ম্মের কথাই বলা হইল। কিন্তু এতদ্ব্যতীত আরও অনেক জিনিসকে ধর্ম্ম বলা হয়, যাহাদের সহিত জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্যের কোনও সম্বন্ধ নাই বা যাহারা জীবের স্বরূপের অনুরূপও নহে—পরন্তু, জীবের ভোগায়তন-দেহের সহিতই যাহাদের মুখ্য সম্বন্ধ। আচারগুলিও আমাদের নিকট ধর্ম্ম; প্রত্যেক সমাজের রীতি-নীতি, আচার, ব্যবহার—সেই সমাজের লোকের পক্ষে ধর্ম্ম; যেমন গোবধ না করা হিন্দুর একটী আচার; ইহা হিন্দুর ধর্ম্ম; কারণ, এই আচারটী তাহাকে হিন্দু-সমাজে ধারণ করিয়া রাখে; এই আচারের লঙ্ঘন করিলে কেহই আর হিন্দু-সমাজে স্থান পায় না। ইহা হিন্দুর একটী সমাজ-ধর্ম্ম। এইরূপে দেশাচার, লোকাচার, স্ত্রী-আচার প্রভৃতিও তত্তদ্বিষয়ে ধর্ম্ম। এই সমস্ত আচারাত্মক ধর্ম্মের সহিত দেহের বা দেহ-সম্বন্ধীয় বস্তুর—ব্যক্তিবিশেষের বা ব্যক্তি-সমূহের—সুখ-সুবিধাদিরই সম্বন্ধ। বেদধর্ম্ম বা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের লক্ষ্যও ইহকালের বা পরকালের ভোগায়তন-দেহের সুখ-সুবিধা বা দুঃখ-নিরাকরণ; জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্যের সহিত ইহার প্রত্যক্ষ কোনও সম্বন্ধ নাই—ইহা জীবের স্বরূপানুরূপ ধর্ম্মও নহে।

আত্মধর্ম্ম ও অনাত্মধর্ম্ম। এইরূপে মোটামোটি দুই শ্রেণীর ধর্ম্ম পাওয়া যায়। প্রথমতঃ—যে সমস্ত ধর্ম্মের সহিত জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্যের সম্বন্ধ আছে, অথবা যে সমস্ত ধর্ম্ম জীব-স্বরূপের অনুরূপ; দ্বিতীয়তঃ—যে সমস্ত ধর্ম্মের সহিত স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্যের কোনও সম্বন্ধ নাই, অথবা যে সমস্ত ধর্ম্ম জীব-স্বরূপের অনুরূপ নহে। প্রথমোক্ত ধর্ম্মসমূহ জীবাত্মা, পরমাত্মা (বা ভগবান্) এবং তাহাদের স্বরূপগত সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং তাহাদিগকে আত্ম-ধর্ম্ম বলা যায়। শেষোক্ত ধর্ম্মসমূহ অনাত্ম-দেহাদির সুখ-সুবিধাদির উপর প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং তাহাদিগকে অনাত্ম-ধর্ম্ম বলা যায়। জীবাত্মা নিত্য, পরমাত্মা নিত্য, উভয়ের সম্বন্ধও নিত্য; সুতরাং তাহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত আত্মধর্ম্মও নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়। দেহাদি অনাত্মবস্তু অনিত্য, পরিবর্ত্তনশীল; সুতরাং তাহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত অনাত্ম-ধর্ম্মও অনিত্য এবং পরিবর্ত্তনশীল; তাই পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারাদির, লোকাচার-দেশাচারাদির—স্থূলতঃ সমস্ত অনাত্ম-ধর্ম্মের বিধি-নিষেধাদির পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। "অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈত্রিকম্। দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ব্রঃ বৈঃ পুঃ কৃষ্ণজন্মখণ্ড। ১৮৫। ১৮০॥"—ইত্যাদি বচনই তাহার প্রমাণ। এই তো গেল অনাত্ম-ধর্ম্মের কথা। আত্ম-ধর্ম্মের সাধনাঙ্গও অনাত্ম-দেহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট—কারণ, অনাত্মদেহ এবং দেহ-সম্বন্ধীয় ইন্দ্রিয়াদি দ্বারাই তাহা অনুষ্ঠিত হয়। দেশ-কালাদি-ভেদে দেহ-রক্ষার উপকরণ বিভিন্ন হয় বলিয়া এবং মনের অবস্থারও বিভিন্নতা জন্মে বলিয়া যুগে যুগে সাধন-ধর্ম্মেরও বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়; শ্রীমদ্ভাগবতই তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন:—"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি-কীর্ত্তনাৎ॥ ১২।৩.৫২॥" উক্ত ভাগবত-বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতও বলিয়াছেন:—"সত্যযুগে ধ্যান-ধর্ম্ম করায় শুক্লমূর্ত্তি ধরি। ত্রেতায় ধর্ম্ম যজ্ঞ করায় রক্তবর্ণ ধরি॥ কৃষ্ণ-পদার্চ্চন হয় দ্বাপরের

ধর্ম্ম। * * * * * * * আর তিনযুগে ধ্যানাদিকে যেই ফল হয়। কলিযুগে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায়॥ মধ্য। ২০॥" শেষ-পয়ারার্দ্ধে "সেই ফল" পদে—সকল যুগেরই সাধ্য-সার বস্তু যে এক, নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু, তাহাই বলা হইয়াছে; কিন্তু তাহার সাধন—এক এক যুগে এক এক রকম—সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে পরিচর্য্যা বা কৃষ্ণ-পদার্চ্চন, আর কলিতে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন।

অবস্থাবিশেষে অনাত্ম-ধর্ম্মই ত্যজ্য। ধর্ম্ম-ত্যাগের অধিকার। যাহা হউক, বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম দেহ-ধর্ম্মাদি অনাত্ম-ধর্ম্ম; ইহাদের তাৎপর্য্য কেবল দেহের সুখ; শ্রীকৃষ্ণসেবারূপ আত্ম-ধর্ম্মের সহিত সাক্ষাদ্‌ভাবে ইহাদের কোনও সম্বন্ধই নাই; বরং এই সমস্ত অনাত্ম-ধর্ম্ম আত্মসুখ-তাৎপর্য্যময় বলিয়া কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবার বিরোধী; তাই কৃষ্ণ-সুখৈক-সর্ব্বস্বা ব্রজদেবীগণ লোকধর্ম্মাদিমূলক অনাত্ম-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াই শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের লোক-ধর্ম্ম বেদ-ধর্ম্মাদি কিছুই নাই; কারণ, তাঁহারা জীব নহেন—লোকধর্ম্মাদি জীবেরই ধর্ম্ম; তথাপি নরলীলার পরিপোষণার্থ ব্রজ-পরিকরগণ লোক-ধর্ম্মাদিকে অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবার অনুরোধে তাহাদেরও উপেক্ষণীয়তা দেখাইয়া গিয়াছেন। বেদধর্ম্মাদি আত্মসুখতাৎপর্য্যময় অনাত্ম-ধর্ম্ম বলিয়াই সাধকদের পক্ষেও তাহাদের ত্যাগের বিধি শাস্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয়। কিন্তু অনাত্ম-ধর্ম্ম হইলেও বেদধর্ম্মাদি ত্যাগের পক্ষে একটা অধিকার-বিচার আছে; শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন—যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ-অবস্থা না জন্মে, কিম্বা যে পর্য্যন্ত ভগবৎ-কথা-শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত কর্ম্ম—(অর্থাৎ যিনি যে অবস্থায় স্থিত, তাঁহাকে সেই অবস্থার অনুরূপ কর্ম্ম) করিতে হইবে। শ্রীভা, ১১।২০।৯॥ কর্ম্ম-ত্যাগের অধিকারী হইয়া নির্জ্জনে নির্ঝঞ্ঝাটে ভজনের নিমিত্ত যিনি লোকসমাজ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়েন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু কর্ম্মত্যাগের অধিকারী হইয়াও যাঁহারা লোক-সমাজে বাস করেন, তাঁহাদিগকেও ভজনের অপ্রতিকূলভাবে বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি বেদধর্ম্মের এবং লোক-ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়; ইহা না করিলে সমাজের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অধর্ম্ম প্রবেশ করিবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়; কারণ, সমাজ-ধর্ম্মাদি পালন না করিলেও ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাদের কোনও ক্ষতি না হইতে পারে; কিন্তু তাঁহাদের অধিকার-বিচারে অসমর্থ অজ্ঞলোকগণ তাঁহাদের দৃষ্টান্তে সামাজিক রীতি-নীতির উপেক্ষা করিয়া নিজেরাও অধঃপতিত হইবে, সমাজকেও কলুষিত করিয়া তুলিবে। শৃঙ্খলা ও সদাচার রক্ষিত না হইলে সমাজের অবস্থা সাধন-ভজনের অনুকূল থাকে না। তাই, কর্ম্মত্যাগের অধিকারী হইয়াও যাঁহারা লোক-সমাজে বাস করেন, ভজনের অনুকূলভাবে, তাঁহাদের পক্ষেও লোক-ধর্ম্মাদির প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শন করা উচিত—ইহাই সামান্য-সদাচার। বৈষ্ণবাচারের সঙ্গে সঙ্গে সামান্য-সদাচারও বৈষ্ণবের পক্ষে পালনীয় বলিয়াই বৈষ্ণব-স্মৃতির প্রণয়নে উভয়বিধ সদাচারের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার নিমিত্ত শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর পার্ষদ-ভক্তগণের মধ্যেও সামান্য সদাচারের মর্য্যাদা—অবস্থানুরূপ আচরণের আদর্শ—দেখিতে পাওয়া যায়। *

---

* পূর্ব্বে পাপ ও অপরাধের পার্থক্যের কথা বলা হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায় এই যে, অনাত্ম-ধর্ম্মের প্রতিকূল আচরণই পাপ এবং আত্ম-ধর্ম্মের প্রতিকূল আচরণই অপরাধ।